

আল কুরআনের মোহনিত্য

হাফিজ আল মুনাদী
ফারহীন জান্নাত মুনাদী

নেদওয়া
পা ব লি কে শ ন



সূচিপত্র

তাআওউয	১৩
আশ্রয়ের প্রার্থনা	১৪
কুরআন পাঠের শুরুতেই কেন বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনা?	১৫
আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে কেন?	১৫
আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মর্ম	১৮
বাসমালাহ	২০
দয়াময়ের স্মরণে	২১
আল্লাহ	২১
রহমান এবং রহিম	২২
সারকথা	২২
কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার তাৎপর্য	২৩
সূরা ফাতিহা	২৫
মর্মার্থে সূরা ফাতিহা	২৫
এক নজরে সূরা ফাতিহা	২৫
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সূরা ফাতিহা	২৬
ফাতিহাতুল কিতাব—কিতাবের ভূমিকা	২৬
উম্মুল কুরআন—কুরআনের মূল	২৭

আসাসুল কুরআন—কুরআনে ভিত	৩১
সাবআ মাসানি—অধিক পঠিত সাত আয়াত	৩২
সুরাতুর রুকইয়া—আরোগ্যের সুরা	৩৩
সুরাতুস সালাত—সালাতের সুরা	৩৪
তাদাব্বুরে-তাফাক্বুরে সুরা ফাতিহা	৩৫
প্রশংসা সবই, কেবল তাঁই	৩৫
তিনি রহমান, তিনি মেহেরবান	৩৭
তিনি বিচার দিনের মালিক	৩৭
শুধু আপনাই ইবাদত করি	৪১
সুরা ফাতিহার আরও কিছু শিক্ষা	৪৬
হিদায়াতপ্রাপ্তির জন্য জরুরি	৪৬
বান্দা তিনটি কাল অতিক্রম করে	৪৭
রবের দাসত্ব	৪৮
শব্দে শব্দে সুরা ফাতিহা	৪৯

সুরা ফিল ৫১

মর্মার্থে সুরা ফিল	৫১
এক নজরে সুরা ফিল	৫১
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সুরা ফিল	৫২
সুরা ফিল—হাতির সুরা	৫২
আমুল ফিল—হাতির বছর	৫২
বাইতুল্লাহ—আল্লাহর ঘর	৫৩
আসহাবুল ফিলের ষড়যন্ত্র	৫৭
তাদাব্বুরে-তাফাক্বুরে সুরা ফিল	৬৩
নবিজির প্রতি সুসংবাদ ও আল্লাহ-বিরোধীদের প্রতি সতর্কতা	৬৪
কুরআনের আলোয় জীবন গড়ি	৬৫
শব্দে শব্দে সুরা ফিল	৬৬

সূরা কুরাইশ

৬৭

মর্মার্থে সূরা কুরাইশ	৬৭
এক নজরে সূরা কুরাইশ	৬৭
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সূরা কুরাইশ	৬৮
নাম-বিচিত্রায় সূরা কুরাইশ	৬৮
তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সূরা কুরাইশ	৬৯
কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ	৬৯
সূরা ফিল, সূরা কুরাইশ এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দু'আ	৭০
সফর আসান হওয়া আল্লাহর রহমত	৭১
সম্মান ও জীবিকার অসিলাকে মূল্যায়ন করুন	৭২
সূরা ফিলের সাথে সূরা কুরাইশের সামঞ্জস্য	৭২
শব্দে শব্দে সূরা কুরাইশ	৭৩

সূরা মাউন

৭৫

মর্মার্থে সূরা মাউন	৭৫
এক নজরে সূরা মাউন	৭৫
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সূরা মাউন	৭৬
মাউন নামের তাৎপর্য	৭৬
সূরা নাযিলের পিছনের গল্প	৭৬
তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সূরা মাউন	৭৮
সূরার প্রথমাংশ : কাফিরের বিবরণ	৭৮
কাফিরদের বিপরীতে মুমিনদের গুণাবলি	৭৯
সূরার দ্বিতীয়াংশ : মুনাফিকের বিবরণ	৮০
মুনাফিকদের বিপরীতে মুমিনদের গুণাবলি	৮২
সূরা মাউন এবং ভোগবাদ	৮৩
যে সমস্ত সালাত আদায়কারীর জন্য ধ্বংস	৮৫
সবচেয়ে অবহেলিত সালাত	৮৬

লোকদেখানো ইবাদত	৮৭
রিয়া থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?	৮৯
ছোট ছোট বিষয়ের বর্ণনায় কুরআন	৯০
আল্লাহর হক এবং বান্দার হক	৯১
আমাদের যত্নহীন সালাত আদায় এবং রবের দয়া	৯২
আপনি কি দেখেননি এবং আপনি কি দেখেছেন	৯৩
সূরা কুরাইশের সাথে সূরা মাউনের সামঞ্জস্য	৯৪
শব্দে শব্দে সূরা মাউন	৯৫

সূরা কাউসার ৯৭

মর্মার্থে সূরা কাউসার	৯৭
এক নজরে সূরা কাউসার	৯৭
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সূরা কাউসার	৯৮
নাম-বিচিত্রতায় সূরা কাউসার	৯৮
ঘটনাপ্রবাহ	৯৮
তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সূরা কাউসার	১০০
কাউসার	১০০
আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি	১০৩
শাব্দিক অলংকার	১০৫
অফুরন্ত দানের ওয়াদা	১০৫
বিস্মৃতির অতলে	১০৬
তাৎপর্যপূর্ণ বিন্যাস	১০৭
শব্দে শব্দে সূরা কাউসার	১০৯

সূরা কাফিরুন ১১০

মর্মার্থে সূরা কাফিরুন	১১০
এক নজরে সূরা কাফিরুন	১১০
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সূরা কাফিরুন	১১১

কী আছে কালিমা তাইয়িবায?	১১১
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই	১১১
সুরা কাফিরুন : ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য	১১২
খাদহীন বিশুদ্ধ ঈমান বাহার চালনি	১১২
এক-চতুর্থাংশ কুরআনকে ধারণ করে যে সুরা	১১৩
আমলে-আযকারে সুরা কাফিরুন	১১৪
ঘটনাপ্রবাহে সুরা কাফিরুন	১১৫
তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সুরা কাফিরুন	১১৭
তাওহিদের মূলনীতি : তাগুতকে অস্বীকার	১১৭
পরাজিত মানসিকতা	১১৮
কাফিরদের সাথে সম্পর্কের রূপরেখা	১১৯
কাফিরকে কাফির বলা	১২০
বন্ধুত্ব কেন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে?	১২১
সেক্যুলারিজম এবং সুরা কাফিরুন	১২৩
সুরা কাফিরুনে কী আছে?	১২৪
‘ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি নেই’-এর জবাব	১২৪
শব্দে শব্দে সুরা কাফিরুন	১২৬

সুরা নাসর ১২৮

মর্মার্থে সুরা নাসর	১২৮
এক নজরে সুরা নাসর	১২৮
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সুরা নাসর	১২৯
বন্ধ হয়ে গেল ওহির দরজা	১২৯
সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরা কোনটি?	১২৯
হাসি-কান্নার অপরূপ বন্ধন	১৩১
তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সুরা নাসর	১৩২
আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়	১৩২
কোন সে প্রতিশ্রুত বিজয়?	১৩৩

দলে দলে ইসলাম গ্রহণ	১৩৪
মুমিনের বিশেষত্ব	১৩৬
আল্লাহর নিয়ামতের অধিক শুকরিয়া আদায়	১৩৭
প্রিয় শব্দে প্রিয়তমের স্মরণ	১৩৮
হামদ-তাসবিহ-সহ রাসুলের ইস্তিগফার পাঠ কেমন ছিল?	১৩৯
ইস্তিগফার—ক্ষমাপ্রার্থনা আর কৃতজ্ঞতার অপূর্ব প্রতিদান	১৪০
একবার না, বারবার তিনি কাছে টেনে নেন	১৪২
তাৎপর্যপূর্ণ বিন্যাস	১৪৩
শব্দে শব্দে সুরা নাসর	১৪৪

সুরা লাহাব ১৪৬

মর্মার্থে সুরা লাহাব	১৪৬
এক নজরে সুরা লাহাব	১৪৬
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সুরা লাহাব	১৪৭
নাম-বিচিত্রায় সুরা লাহাব	১৪৭
সুরা নাযিলের প্রেক্ষাপট	১৪৭
তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সুরা লাহাব	১৫৫
নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া জরুরি	১৫৫
বৈশ্বিক পরাশক্তি এবং আজকের দিনে সুরা লাহাবের বাস্তবতা	১৫৬
সম্পর্কের জের ধরে জান্নাতে যাওয়া যাবে না	১৫৭
শব্দে শব্দে সুরা লাহাব	১৫৮

সুরা ইখলাস ১৫৯

মর্মার্থে সুরা ইখলাস	১৫৯
এক নজরে সুরা ইখলাস	১৫৯
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সুরা ইখলাস	১৫৯
ইখলাস - একনিষ্ঠতা	১৫৯
আল্লাহর পরিচয়	১৬০

ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য	১৬০
যে সুরা পাঠে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তি ও ক্ষমার সুসংবাদ	১৬৩
সুরা ইখলাসের প্রতি মহব্বত	১৬৩
যে সুরায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়	১৬৪
জান্নাতে যার জন্য অটালিকা নির্মিত হবে	১৬৫
ফেরেশতারাও যার জানাযায় দুআ করবেন	১৬৬
কুরআন খতমের সাওয়াবের তাৎপর্য	১৬৭
তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সুরা ইখলাস	১৬৮
আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়	১৬৮
আল্লাহ আহাদ ও সামাদ	১৬৯
জন্ম নেওয়া/জন্ম দেওয়া কেন আল্লাহর জন্য ত্রুটি?	১৭০
তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই	১৭১
শব্দে শব্দে সুরা ইখলাস	১৭৩

সুরা ফালাক ১৭৪

মর্মার্থে সুরা ফালাক	১৭৪
এক নজরে সুরা ফালাক	১৭৪
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সুরা ফালাক	১৭৪
আল-মুআওয়যাতান	১৭৪
মুআওয়যাতানের ফজিলত	১৭৫
মুআওয়যাতান নাযিলের পিছনের গল্প	১৭৬
তাফাক্কুরে-তাদাব্বুরে সুরা ফালাক	১৮০
উষার রবের কাছে আশ্রয় গ্রহণ	১৮০
সমস্ত কিছুই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণ	১৮১
রাতের অনিষ্ট থেকে পানাহ	১৮২
রাতের কথা বিশেষভাবে কেন বলা হলো?	১৮৩
জাদুকরের অনিষ্ট থেকে পানাহ	১৮৬
হিংসূকের হিংসা থেকে পানাহ	১৮৭

হিংসা কীভাবে দূর করব?	১৮৯
হিংসাপ্রবণ মানুষ এবং আল্লাহর দয়া	১৯০
সৃষ্টিজীবের কিছু চিহ্নিত অনিষ্ট	১৯১
শব্দে শব্দে সুরা ফালাক	১৯২

সুরা নাস ১৯৪

সুরা নাসের মর্মকথা	১৯৪
এক নজরে সুরা নাস	১৯৪
প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সুরা নাস	১৯৪
আল্লাহ সুরক্ষা দানকারী	১৯৪
রব, মালিক ও ইলাহ	১৯৫
খান্নাসের ওয়াসওয়াসা	১৯৬
ওয়াসওয়াসা কী?	১৯৭
বড় যে ক্ষতি	১৯৯
যে অন্তর শক্তিশালী	১৯৯
একটি প্রশ্ন ও উত্তর	২০১
রব মানুষের, মানুষের রব	২০২
শুরু ও শেষের প্রার্থনার মানযিল তিনি	২০৩
শব্দে শব্দে সুরা নাস	২০৪





সুরা মাউন

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا
يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَوُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

মর্মার্থে সুরা মাউন

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো ওই ব্যক্তি—
যে ইয়াতিমকে রুঢ়ভাবে তড়িয়ে দেয়; আর সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ
প্রদান করে না। কাজেই দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের—যারা তাদের সালাত
সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোকদেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয়
ছোটখাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।^১

এক নজরে সুরা মাউন

- » কুরআন মাজিদের ধারাবাহিকতায় সুরা নম্বর ১০৭
- » এ সুরায় রুকুস সংখ্যা ১টি; আয়াত সংখ্যা ০৭টি; শব্দের সমষ্টি ২৫টি; হরফ
সংখ্যা ১২২টি।
- » সুরাটি মাক্কি, মক্কায় অবতীর্ণ।
- » এ সুরার ভিন্ন কোনো নাম নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সুরা মাউন

মাউন নামের তাৎপর্য

মাউন অর্থ সাধারণ গৃহস্থালির জিনিসপত্র (হাড়ি-পাতিল, গ্লাস, লবণ, পানি)। এ সুরায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন সসমস্ত কৃপণ মানুষের তিরস্কার করেছেন, যারা সংসারের ছোটখাটো বিষয়েও কৃপণতা করে। এজন্য সুরাটির নাম সুরা মাউন।

সুরা মাউনে বর্ণিত কৃপণতা অভাব নয়; বরং মানসিকতার সাথে সম্পৃক্ত, যা একজন মুমিনের জন্য কখনোই শোভা পায় না। আমরা তো তাদের উত্তরসূরি, যারা সারাদিন সিয়াম পালন করে নিজের ইফতারিটুকুও আরেক জনকে দিয়ে দিতেন।

সুরা মাউনে শুধু কৃপণতা নয়, উল্লেখিত হয়েছে রক্ষ ব্যবহার, সালাতে গাফলতি, রিয়া-সহ আরও কিছু সিফাত, যা একজন মুমিনের মধ্যে কোনোভাবেই থাকতে পারে না। কাদের মধ্যে থাকতে পারে? ‘যারা হিসাব দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।’ যেন এ সমস্ত বদ স্বভাবের মূলে পরকালের প্রতি মিথ্যাপ্রতিপন্নতা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাই সুরার শুরুতে বলছেন—

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?

আয়াতের ইউকায়যিবু (মিথ্যা প্রতিপন্ন করে) শব্দটি ‘আত তাকযীবু’ মাসদার থেকে। এ সুরার আরেকটি নাম তাই সুরাতুত তাকযিব। আবার এ সুরার শুরুর শব্দ ‘আরাআইতা’ হওয়ায় এ সুরাটিকে সুরাতু আরাআইতাও বলা হয়।

সুরা নাযিলের পিছনের গল্প

ইবনু জুরাইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সুরাটি আবু সুফিয়ান ইবনু হারব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে প্রতি সপ্তাহে একটা করে উট জবাই করত এবং আয়েশ ও মৌজ করে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব নিয়ে ভূরিভোজন করত। একবার একটি ইয়াতিম শিশু এসে খাবারে শরিক হতে চাইল। কিন্তু আবু সুফিয়ান তাকে খাবার দিল না, বরঞ্চ লাঠি দিয়ে আঘাত করল এবং গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সুরা নাযিল হয়।

আবার এক মত অনুযায়ী আবু জাহল হলো এই সুরার প্রথম উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। ইমাম রাযি রহিমাহু লাহি লিখেছেন, আবু জাহল এক ইয়াতিমের অভিভাবক ছিল। কিন্তু সে তার হক যথাযথ আদায় করত না। একদিন সে বালকটি তার কাছে এসে নিজের সম্পদ ফেরত চাইল। আবু জাহল তাকে রুঢ়ভাবে তাড়িয়ে দিল। সে মনঃক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেল।

কুরাইশদের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। তারা সবসময়ই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমানিত করার যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তারা সে বালকটিকে বুদ্ধি দিল, ‘যাও! মুহাম্মাদের কাছে যাও। সে যদি কিছু করতে পারে!

তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আবু জাহল কর্তৃক আল্লাহর রাসুলকে অপমানিত হতে দেখা। আবু জাহল যে কস্মিনকালেও সম্পদ ফেরত দেবে না, এ ব্যাপারে তারা ছিল নিশ্চিত। তারা এও জানত, বালকের অধিকার যে চাইতে যাবে, তাকেই আবু জাহল অপমানিত করে ছাড়বে।

বালকটি সত্যিই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল। সে নবীজির কাছে আবু জাহলের ব্যাপারে অন্যায়ের অভিযোগ করল। নবীজির অনন্য একটি গুণ ছিল, তিনি কখনো তার দরবারে আসা ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতেন না। বালকটিকে নিয়েও তিনি আবু জাহলের কাছে রওনা হলেন। আবু জাহলের ঘরে গিয়ে তাকে ডাকলেন। আবু জাহল দরজা খুলল। আল্লাহর রাসুল আবু জাহলকে বললেন, সে যেন ইয়াতিম বালকটিকে তার হক বুঝিয়ে দেয়। আবু জাহল ভদ্রমানুষের মতো ইয়াতিম বালকটির সবকিছু বুঝিয়ে দিল।

কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! মজা দেখতে যাওয়া কুরাইশের দলের আশার গুড়ে বালি পড়ল। তারা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না! আবু জাহল যখন তাদের কাছে এলো, তখন তারা তাকে ভৎসনা করতে লাগল। ‘কী! তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে!’ আবু জাহল বলল, ‘কখনোই না। তবে মুহাম্মাদ যখন আমার কাছে আসল, আমি তার ডানে ও বামে বর্শা দেখতে পেলাম। ভয় হলো, আমি যদি বালকটির হক তাকে না বুঝিয়ে দিই, তাহলে এ বর্শা বুঝি আমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে!’ এ ঘটনাকে সামনে রেখে সুরা মাউন নাযিল হয়।

এ সুরা নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে আরও কয়েকটি মত আছে। তাফসিরবিদদের বিভিন্ন মতে একেক জন কাফিরের নাম উঠে এসেছে। মুফাসসির কালবি,

মাকাতিল, আবু সালেহ রাহিমাছুম্বল্লাহ প্রমুখ বলেছেন, সূরাটি নাযিল হয়েছে আস ইবনু ওয়াইলের ব্যাপারে। আল্লামা সুদ্দি রাহিমাছুম্বল্লাহ বলেছেন, সূরাটি ওয়ালিদ ইবনু মুগিরাকে ঘিরে নাযিল হয়েছে।

যদিও এ সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপটের সাথে এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম জড়িত আছে, তবে এ সূরার নির্দেশনাগুলো শুধুমাত্র ওই ব্যক্তিবর্গের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ অকুম ব্যাপক ও সকলের জন্য প্রযোজ্য।

তাদাব্বুরে-তাফাক্কুরে সূরা মাউন

সূরার প্রথমাংশ : কাফিরের বিবরণ

এ সূরার প্রথমাংশে কাফিরের বিবরণ এসেছে, যে কি না বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। এরপর তার কিছু বদখাসলতের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো ওই ব্যক্তি—যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়; আর সে অভাবগ্রস্তের খাদ্যের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে না। এখান থেকে আমরা তিনটি বিষয় শিখতে পারি—

১. সূরা মাউনে উল্লেখিত বদখাসলাত, বদস্বভাব ও দুষ্কর্মে মূলে রয়েছে পরকালের প্রতি অবিশ্বাস কিংবা বিশ্বাসের ঘাটতি।

২. হিসাব দিবসকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি তো কাফির। তবে তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে দ্বিতীয় আয়াত থেকে এমন কিছু বিষয় উল্লেখিত হয়েছে—যাতে কুফরি নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকারের বিষয়গুলো নেই; বরং কিছু মন্দ অভ্যাসের উল্লেখ আছে। বুঝা গেল, যেন এ মন্দ অভ্যাসগুলো কাফিরদের বৈশিষ্ট্য, কোনো মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি কেউ করে, সে পরিপূর্ণ মুমিন নয়।

৩. এ আয়াতগুলো যেন মুমিনদের জন্য হুঁশিয়ারি। পরকাল দিবসে অবিশ্বাসী ব্যক্তির মন্দ অভ্যাসগুলো যদি কোনো মুমিনের মাঝে পাওয়া যায়, তবে সমূহ শঙ্কা আছে ধীরে ধীরে এ বদ অভ্যাসগুলো তাকে কুফরির দিকে নিয়ে যাবে। মাআযাল্লাহ!

কী সে অভ্যাস?

» ইয়াতিমের সাথে রূঢ় আচরণ

» মিসকিনকে না খাওয়ানো এবং অন্যকে উৎসাহী না করা

উল্লেখ্য, উক্ত বদম্বভাবসমূহ কোনো মুমিনের মাঝে পাওয়া গেলে, তাকে তার বদ অভ্যাসসমূহের জন্য শাস্তি পেতে হবে, আবার আল্লাহ চাইলে ক্ষমাও করতে পারেন। কেননা, তিনি শিরক ক্ষমা করেন না; এছাড়া সমস্ত গুনাহ তিনি যার জন্য চান ক্ষমা করেন।

নিছক বদ অভ্যাস কিংবা পাপের কারণে কেউ কাফির হয়ে যায় না, পাপ যতই গুরুতর হোক না কেন। কোনো ব্যক্তির ঈমান আনয়নের পর কুফরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট কুফরি কিংবা শিরক সাব্যস্ত হওয়া জরুরি।

ইবনু কাসির রাহিমাল্লাহ বলেন, ইয়াতিমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোকদেখানো সালাত পড়া এবং যাকাত না দেওয়া—এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গুনাহ। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোগের ফলে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল জাহান্নাম বাস।

কাফিরদের বিপরীতে মুমিনদের গুণাবলি

সূরা মাউনের প্রথম তিন আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসী কাফিরের অবস্থা যখন আমরা জানতে পারলাম, তখন নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে প্রবল এক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে, পরকালে বিশ্বাসী মুমিনের গুণাবলি তবে কেমন? যেন মন্দ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করে সে উত্তম গুণগুলো আমরা অর্জন করতে পারি। আমাদের অন্তরকে শীতল করে সূরা বাকারার শুরু দিকের আয়াতসমূহ; আমরা খুঁজে পাই আমাদের কৌতূহলের জবাব। আল্লাহ সূরা বাকারার শুরুতে পরকালে দৃঢ়বিশ্বাসীকে মুত্তাকি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘ওই কিতাবে কোনো সংশয় নেই, তা পথনির্দেশ মুত্তাকিদের জন্য—

» যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে,

» যথাযথভাবে সালাত আদায় করে;

» আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে;

» যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ ও আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি

বিশ্বাস রাখে।

আর তারাই পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিদায়াতের ওপর রয়েছে আর তারাই সফল!'^২

বুঝা গেল, কাফির ব্যক্তি আল্লাহর হকের ব্যাপারে উদাসীন, মানুষের হকের ব্যাপারেও বেপরোয়া। তাদের খারাপ অভ্যাসসমূহের মূলে পরকালের প্রতি অবিশ্বাস। পক্ষান্তরে পরকালে বিশ্বাসী মুমিন আল্লাহর হকের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও বান্দার হকের ব্যাপারেও যত্নশীল। আর তাদের সমস্ত ভালো গুণের মূলে আল্লাহ, তাঁর রাসুল, কিতাবসমূহ ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

সুরার দ্বিতীয়াংশ : মুনাফিকের বিবরণ

সুরার দ্বিতীয়াংশে এসেছে মুনাফিকদের বিবরণ, যারা কিনা সালাতে উদাসীন। আল্লাহ দ্বিতীয়াংশে মুনাফিকদের কিছু বদখাসলতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য ওয়াইল তথা দুর্ভোগ, ধ্বংস ও জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ‘ধ্বংস ওই সমস্ত মুসল্লিদের জন্য—যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোকদেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।

মুসল্লি কাফির হয় না, কাফিররা সালাত আদায় করে না। সালাত আদায় করে মুমিনরা। তবে প্রকৃত মুমিনের কথাও আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেননি। কেননা, প্রকৃত মুমিন সালাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে না। সে যথাসময়ে সালাত আদায় করে এবং সালাতে বিনম্রচিত্তে দাঁড়িয়ে মনোযোগ নিবিষ্ট রাখে।

সালাতের ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক। সে যথাসময়ে সালাত আদায়ের ব্যাপারে গাফিল থাকে; আর অলসতা নিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে অমনোযোগী থাকে। আল্লাহ কুরআনে সালাত আদায়কারী মুমিন ও সালাত আদায়কারী মুনাফিকের কথা উল্লেখ করেছেন। সালাত আদায়কারী মুমিন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২-৫

সফল সেসমস্ত মুমিন, যারা তাদের সালাতে বিনম্র ও একাগ্রচিত্ত।^৭

একইভাবে আল্লাহ সফল মুমিনদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য বলেন—

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে যথাযথভাবে পাবন্দি করে।^৮

পক্ষান্তরে মুনাফিকদের সালাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٣﴾

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেয়। মূলত তারা তাদের নিজেদেরকে ধোকা দেয়। যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায়; অথচ তারা (সালাতে) আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।^৯

সূরা মাউনে আল্লাহ সালাতে উদাসীন মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করে তাদের জন্য হুঁশিয়ারি করেছেন; আর তাদের আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

- তারা লোকদেখানো ইবাদত করে,
- মানুষকে অতি মামুলি জিনিসপত্র দিতেও কার্পণ্য করে, কপ্তুসি করে।

অর্থাৎ সালাতে অলসতা, উদাসীনতা, রিয়া ও কৃপণতা এগুলো যেন কেবল মুনাফিকের জন্যই সাজে। কোনো মুমিনের জন্য এ গুণগুলো শোভা পায় না।

কাজেই, যদি কোনো ঈমানদারের মাঝে এ সিফাতগুলো থাকে, তার সতর্ক হওয়া উচিত দুই কারণে—

১. তার মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা একজন মুমিনের মধ্যে থাকে না এবং থাকা শোভনীয় নয়।

[৩] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২

[৪] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯

[৫] সূরা নিসা, আয়াত : ১৪২

২. এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে সে বিপজ্জনক অবস্থানে আছে, যখন-তখন সে আখিরাতকে অস্বীকারকারীদের দলে কিংবা মুনাফিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন।

মুনাফিকদের বিপরীতে মুমিনদের গুণাবলি

সূরা মাউনের দ্বিতীয়াংশ আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুনাফিকদের ৩টি নিন্দনীয় স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের পরিণতি ওয়েইল জানিয়েছেন। মুনাফিকের জন্য নির্ধারিত পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে একজন মুমিনের কী করণীয়, তা সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, উল্লেখিত স্বভাবসমূহ থেকে বাঁচতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত মুমিনের গুণাবলি আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। প্রকৃত মুমিনের গুণাবলি কেমন, সে সম্পর্কে আলোকপাত হয়েছে সূরা মুমিনূনের শুরুতে।

আল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই সফল হয়েছে সে সমস্ত মুমিন—

১. যারা তাদের সালাতে একাগ্রচিত্ত ও বিনম্র;
২. যারা অহেতুক কথা ও কাজ থেকে বিরত;
৩. যারা যাকাত আদায় করে;
৪. যারা তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে—তবে নিজেদের স্ত্রী ও তাদের ডানহাতের মালিকানা (দাসী) ব্যতীত, কেননা সেক্ষেত্রে তারা নিন্দিত নয়। যারা এছাড়া ভিন্নপথ অন্বেষণ করবে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী;
৫. যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী;
৬. যারা তাদের সাম্প্র্য যথাযথভাবে প্রদানকারী;
৭. যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে যথাযথভাবে পাবন্দি করে।

তরাই উত্তরাধিকারী। তারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার পাবে আর সেখানে চিরকাল থাকবে।’^৬

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা আখলাকের সাথে ঈমানের সম্পর্ক গভীরভাবে

[৬] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১-১১

উপলব্ধি করতে পারি। আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম আখলাক আমাদের ঈমানকে মজবুত করে, ঈমানের ওপর আমাদের দিল প্রশান্ত করে এবং যে সিফাতগুলো একজন জন্মাতী মানুষের হওয়া উচিত, সে সিফাতগুলো নিজের মাঝে আনতে সহযোগিতা করে।

পক্ষান্তরে আখলাকে সূ বা মন্দ আখলাক আমাদের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। মন্দ আখলাক কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। অসততা, মিথ্যা, অহংকার ইত্যাদিতে ডুবে থাকতে থাকতে একসময় ব্যক্তি সালাত, সিয়াম ইত্যাদির ব্যাপারেও উদাসীন হয়ে যায়। মন চাইলে পালন করে, না চাইলে নেই এবং এতে তার কোনো বিকার থাকে না। এভাবে তার ঈমানের মাঝে বড় ধরনের ফাটল দেখা দেয়।

মন্দ আখলাকের অধিকারী মুমিন কেবল নিজের ঈমানকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, তার দ্বারা মুসলিম উম্মাহর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। তার কারণে মানুষের কাছে ইসলামের ব্যাপারে ভুল বার্তা যায়। যেমন, ভারতের একজন নওমুসলিম তার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমি যদি কুরআন না পড়ে মুসলিমদেরকে অনুসরণ করতাম এবং তাদেরকে নিয়ে গবেষণা করতাম, তাহলে হয়তো ঈমানের দৌলত আমার নসিব হতো না। কী করুণ অবস্থা আমাদের! আল-ইয়াযুবিল্লাহ!

আখলাক মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একজন অমার্জিত মুমিনের চেয়ে মার্জিত স্বভাবের নাস্তিক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে, তার মতবাদকে শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত করতে পারে। অপরদিকে একজন মুমিন ও সমাজের একটা পিলার হতে পারে, যদি তার কথায় ও কাজে মিল থাকে। অতএব, আখলাক ও ঈমান—একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সূরা মাউন এবং ভোগবাদ

সূরা মাউনের তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন, ‘এবং সে উৎসাহ দেয় না মিসকিনদের খাবারের ব্যাপারে।’

এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন **إِطْعَامُ الْمُسْكِينِ** না বলে **طَعَامُ الْمُسْكِينِ** বলেছেন। **طَعَامُ الْمُسْكِينِ** অর্থ মিসকিনের খাবার; আর **إِطْعَامُ الْمُسْكِينِ** অর্থ মিসকিনকে খাওয়ানো।

অর্থাৎ আল্লাহ ‘মিসকিনকে খাওয়ানোর’ ব্যাপারে না বলে বলেছেন ‘মিসকিনের

খাবারের’ ব্যাপারে। যেন মিসকিনকে যে খাবারটা খাওয়ানো হবে, সেটা অন্যের উপার্জন হলেও মিসকিনের নিজেরই খাবার; যেন এটা তার অধিকার! যেন সে তার নিজেরই খাবার খাচ্ছে। আল্লাহ আহরদাতাকে কাজে লাগিয়েছেন মাত্র।

‘মিসকিনের খাবার’ কথাটুকুর মাঝে মিসকিনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে বাধ্যবাধকতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ মিসকিনকে খাওয়ালে খাওয়ালাম, না খাওয়ালে না খাওয়ালাম, বিষয়টা এমন নয়। যেটা মিসকিনের খাবার, সেটা তাকে খাওয়াতেই হবে।

‘আমি যা খাওয়াচ্ছি, সেটা মিসকিনের নিজেরই খাবার’ এই চিন্তা নিয়ে আহরদাতা যখন মিসকিনকে খাবার প্রদান করবে, তখন তার মাঝে অনুগ্রহ ফলানোর মানসিকতা থাকবে না; থাকবে কর্তব্য পালনের দায়বদ্ধতা এবং থাকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ। আহরদাতা অনুভব করবে, সে তো মিসকিনকে তার খাবারই প্রদান করছে; আর আল্লাহ তাকে তার কর্তব্য পালনে তাওফিক দান করেছেন। সে তো কেবল হকদারের কাছে তার হক পৌঁছে দিয়েছে মাত্র।

এ আয়াতে পুঁজিবাদের সাথে ইসলামের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পুঁজিবাদ বলে, আপনি যা উপার্জন করবেন সবই আপনার; পক্ষান্তরে ইসলাম বলে, সবই আপনার নয়; বরং এখানে আছে অভাবী, মিসকিন ও বঞ্চিতের হক। সূরা যারিয়াতে আল্লাহ মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হিসেবে তা স্পষ্ট করে বলেছেন—

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٩﴾

তাদের সম্পদের রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।^৭

طَعَامُ الْمُسْكِينِ বা ‘মিসকিনের খাবার’ কথাটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে মিসকিনের নিজের খাবার। অর্থাৎ মিসকিনকে নিজেদের খাবার থেকে আহর করানো তো দূরের কথা, তারা মিসকিনের উপার্জিত কিংবা মালিকানাধীন খাবারটুকুও তাকে দেয় না, বরং বঞ্চিত করে। কত নিকৃষ্ট!

সমাজে দরিদ্র, দলিত ও মিসকিনকে বঞ্চিত করা সহজ। তারা তাদের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হতে পারে না। ফলে জালিমরা সর্বপ্রথম মিসকিনদেরই বঞ্চিত

[৭] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৯

করে। এ দেশের মতো অনৈসলামিক সমাজে সবাই যার যার অধিকার বুঝে পেলেও বঞ্চিতরা বঞ্চিতই থেকে যায়। দেখবেন, আমাদের সমাজে দরিদ্রদের চাল-ডাল এমনকি কম্বলও লুণ্ঠিত হয়। সেগুলো চলে যায় নেতাদের ঘরে, দলীয় কর্মীদের পকেটে। এ দেশে দরিদ্র কৃষক তার ফসলের প্রাপ্য মূল্যটুকুও পায় না, অথচ বাজারে দ্রব্যমূল্যে ঠিকই আগুন। কারখানায় শ্রমিক তার প্রাপ্য অধিকার পায় না, কিন্তু কোনো পণ্যের মূল্যই কম নয়! সব লুটে নেয় শোষক শ্রেণি; আর বঞ্চিত শ্রেণি বঞ্চিতই থেকে যায়।

মানুষের যত হক আছে, সেসবের মাঝে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও বেসিক নিড হচ্ছে খাবার। সুরা মাউনে উল্লেখিত শ্রেণি তাদেরকে সে মৌলিক অধিকার খাদ্যটুকু থেকেও বঞ্চিত করে। অর্থাৎ এরা মিসকিনকে আহার করাবে তো দূরের কথা, মিসকিনদের নিজেদের যতটুকু আহার আছে, তারা তাও আত্মসাৎ করে।

মুফাসসিরগণ আরেকটি ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেটা হচ্ছে- **طعام** শব্দটি **إطعام** এর অর্থে এসেছে। সেক্ষেত্রে মর্মার্থে দাঁড়াবে, সে তো নিজে মিসকিনকে হক দেয় না আবার অন্যকেও উৎসাহিত করে না। এর বিপরীতে মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে নিজে খাওয়ায় এবং অন্যকে আহারদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে।

যে সমস্ত সালাত আদায়কারীর জন্য ধ্বংস

চতুর্থ আয়াত থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিছু সালাত আদায়কারীর বর্ণনা করেছেন। অবাক করার বিষয় হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সালাত আদায়কারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য ধ্বংসের কথা বলেছেন। ধ্বংস বুঝাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে, **وَيُزِيلُ** (ওয়াইলুন)।

وَيُزِيلُ (ওয়াইলুন) একটা কঠিন শব্দ। শাব্দিক অর্থ ধ্বংস। কেউ বলেছেন, ওয়াইল হচ্ছে জাহান্নামের অংশ, যে অংশ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট। সেই বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে এই নির্দিষ্ট শ্রেণির সালাত আদায়কারীরাও আছে।

সালাত আদায় করা সত্ত্বেও কেন তাদের জন্য ওয়াইল? আল্লাহ যেন তার জবাবে বলেছেন, ‘যারা তাদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন’

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তারা হচ্ছে এমন মুসল্লি যারা সালাত আদায় করলেও সাওয়াবের আশা রাখে না আবার সালাত পরিত্যাগ করলে তার

শাস্তিকেও ভয় পায় না।^৮

অর্থাৎ, সালাত তাদের কাছে তেমন গুরুত্ব রাখে না। সালাত আদায় করতে হবে তাই সালাত আদায় করছে অথবা অভ্যাসবশত সালাত আদায় করছে। আল্লাহ হিফাজত করুন, আজকাল তো কেউ কেউ ‘পশ’ বুঝানোর জন্যও সালাত আদায় করে। যেন বুঝাতে চায়, আমি সমাজের এমন অবস্থানে থেকেও ধর্মচর্চা করি, আমি কত সৎলোক!

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেক বর্ণনায় আছে, যারা তাদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন—কথাটির অর্থ হচ্ছে যারা ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে পড়ে অর্থাৎ উদাসীনতা করে অকারণেই সালাত কাযা করে ফেলে। ফজরের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে, ডেকে ডেকেও তোলা যাচ্ছে না, ‘উঠি, উঠছি’ করে ঘুমিয়েই ওয়াক্তটা পার হয়ে গেল। এটার নাম উদাসীনতা। একই মানুষকে যদি বলা হয়, আজ পরীক্ষা অথবা চাকরির ইন্টারভিউ, হয়তো চিন্তায় তার ঘুমই হবে না।

সবচেয়ে অবহেলিত সালাত

ফজরের সালাত মানুষ সবচেয়ে বেশি কাযা করে। আজকাল তো আমাদের সালাতের প্রতি উদাসীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, রাত জেগে কাজ করা বা অনলাইনে বুঁদ হয়ে থাকাকে এলিট শ্রেণির লাইফস্টাইল ভাবি। এরপর কোথায় যায় ফজর আর কোথায় তাহাজ্জুদ! ফজর পড়ার ন্যূনতম প্রস্তুতিই আমাদের থাকে না। রাতে কাজে মনোযোগ আসে, এটার মতো অর্থহীন অজুহাত দ্বিতীয়টি হতে পারেনা। কারণ, স্বয়ং রাতের স্রষ্টা বলেছেন, ‘তিনি রাত করেছেন প্রশান্তিস্বরূপ।’^৯

সেসমস্ত মানুষের কথা তো ভীষণ আশ্চর্যের, যারা নেশার মতো বুঁদ হয়ে অনলাইনে পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ইউটিউব, টিকটক আর নানারকম শয়তানী কর্মকাণ্ডে পার করে অর্ধরাত্রির বেশি। তাহাজ্জুদে যখন আল্লাহ সজাগ হতে ডাকেন, তখন তারা ঘুমাতে যায় আর ফজর পেরিয়ে সূর্যের আলোকচ্ছটায ঘুম ভাঙে; যেমন ভাঙে সূর্যপূজারিদের।

সেসমস্ত সালাত আদায়কারীদের জন্য ওয়াইল, ওয়াইল এবং ওয়াইল।

[৮] ইবনু কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, সূরা মাউনের তাফসির

[৯] সূরা আনআম, আয়াত : ৯৬

লোকদেখানো ইবাদত

যে সমস্ত মুসল্লিদের জন্য আল্লাহ ধ্বংসের কথা বলেছেন, তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা লোকদেখানো ইবাদত করে। আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন কাউকে দেখানোর জন্য ইবাদত করাকে বলে রিয়া।

রিয়ার মূল বিষয় হলো ইবাদতে পার্থিব কোনো কিছুর প্রত্যাশা থাকা। রিয়া মানুষের অন্তরে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। একমাত্র আল্লাহর জন্য শুরু করা ইবাদতেও মাঝপথে রিয়া অনুপ্রবেশ করতে পারে।

মানুষ আল্লাহর জন্য ইবাদত করছে কি না, বুঝার উপায় হচ্ছে মানুষের সামনে কোনো কাজ যতটা সুন্দরভাবে ও আশ্রয়ের সাথে করা হয়, মানুষের আড়ালে তা সেভাবে করা হয় কি না। অনেকে আছেন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে থাকলে সালাত আদায় করেন, কিন্তু একাকী থাকা অবস্থায় সেভাবে সালাতের গুরুত্ব তার মাঝে কাজ করে না। অহেতুক শো-আপ করার মানসিকতার মধ্য দিয়ে রিয়া প্রকাশ পেতে পারে।

রিয়া থেকে বাঁচার জন্য কিছু কিছু ইবাদত সর্বদা গোপনে করা উচিত। আবার সমস্ত ইবাদত গোপনে করার সুযোগ নেই। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত। ফরজ সালাত জামাতেই পড়তে হবে। সিয়াম, হজ, যাকাত, জিহাদ সবই প্রকাশ্য ইবাদত। ফরজ ইবাদত গোপনে পরিপূর্ণরূপে আদায় করা যায় না। যেমন, ফরজ সালাত জামাতে আদায় করা ফরজ; নিয়মিত জামাত তরক করা মুনাফিকের লক্ষণ।

আমরা নিয়মিত কিছু কিছু নফল ইবাদত গোপনে করতে পারি। যেমন : নফল সাদাকা, নফল সালাত ইত্যাদি—যা জানবে বান্দা ও তার রব! আল্লাহ বলেন—

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ... ﴿٢٧﴾

যদি তোমরা সাদাকা প্রকাশ করো, তা তোমাদের জন্য উত্তম; আর যদি গোপন রাখো, তবে তা কতই-না উত্তম!^{১০}

[১০] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭১

মূলত প্রকাশ করা না করার ক্ষেত্রে ফরজ এবং নফলের মাঝে পার্থক্য আছে। ফরজের ক্ষেত্রে রিয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা প্রকাশ করতে হবে। গোপন করা হলে বরং তা যথাযথভাবে আদায় হয় না। এতে মানুষের উক্ত ব্যক্তির প্রতি আরও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে নফল সালাতের হক হচ্ছে, গোপন থাকা। কারণ কেউ যদি নফল পড়ে, তাহলে তার প্রশংসা করা হয়, না পড়লে নিন্দা হয় না। এটা স্বতন্ত্র গুণ। কাজেই, এর প্রশংসা ব্যক্তির মধ্যে রিয়ার বীজ বপন করতে পারে।^{১১}

রিয়া সম্পর্কে হাদিসে নানাভাবে সতর্ক করা হয়েছে, বলে দেওয়া হয়েছে রিয়ার পরিণতি। আল্লামা ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ সুরা মাউনের তাফসিরে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, ‘জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে, স্বয়ং জাহান্নাম এই উপত্যকা থেকে দৈনিক ৪০০ বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। এটি প্রস্তুত করা হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদির লোকদেখানো আমলকারীদের জন্য। যেমন, (দুনিয়াপ্রাপ্তির জন্য) কিতাবুল্লাহ ধারণকারী, আল্লাহর সমষ্টি ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে সাদাকাকারী, বাইতুল্লাহ হজকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ব্যক্তি।’^{১২}

রিয়া কয়েক ধরনের হতে পারে—

আমলের রিয়া : লোকসম্মুখে ভালো কাজগুলো আদায় করা, যা লোকের আড়ালে করা হয় না। যেমন, সালাতের রুকু-সিজদা দীর্ঘায়িত করা, সাদাকা করা ইত্যাদি।

কথার রিয়া : এমন কথার প্রতি উন্মুখ থাকা, যাতে লোক চমৎকৃত হয়। যেমন : হক কথা বা প্রয়োজনীয় কথার তুলনায় মুখরোচক কথার প্রতি আগ্রহী থাকা, যে কোনো বিষয়েই কথা বলতে চাওয়া, যেন লোকে তাকে জ্ঞানী ভাবে ইত্যাদি।

জাহির করার রিয়া : গোপন আমলকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করার প্রবণতা। যেমন : সিজদায় কপালে বেশি জোর দেওয়া যেন তাতে সিজদার চিহ্ন ফুটে ওঠে আর লোক তাকে অধিক সালাত আদায়কারী ভাবে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মোটা কাপড় পরিধান করা; অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার পরিচয় না দেওয়া ইত্যাদি।

রিয়া ইখলাসের বিপরীত। বিভিন্ন হাদিসে রিয়াকে ‘শিরকে আসগার’ বা ছোট শিরক এবং ‘শিরকে খফী’ বা লুকায়িত শিরক বলা হয়েছে। কারণ, বান্দা আল্লাহর জন্য

[১১] কুরতুবি, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, সুরা মাউন

[১২] আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ১/৫১

ইবাদতের পাশাপাশি অন্য সৃষ্টি থেকেও ‘কিছু’ আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত ধ্বংস ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। মাহমুদ ইবনু লাবিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ الرَّيَاءُ

আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টির ভয় পাই তা হলো, শিরকে আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক—রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা।^{১৩}

রিয়া থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

যেকোনো গুনাহ থেকে পরিত্রাণের জন্য সবার আগে জরুরি হচ্ছে, নিজেকে গুনাহগার ভাবা। কেউ যদি নিজের মধ্যে অসুস্থতা সত্ত্বেও নিজেকে অসুস্থ না ভাবে বা এড়িয়ে যায়, সে রোগীর আরোগ্য সম্ভব নয়। তেমনি সবার আগে আবশ্যিক নিজেকে গুনাহগার ভাবা। এরপর যে পদক্ষেপগুলো আমরা নিতে পারি—

- » অধিক হারে দুআ করা, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।
- » রিয়ার ব্যাধি দূর হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন কিছু সময় রিয়ার পরিণতি উপলব্ধি করা। রিয়া সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে (নেক আমল দ্বারা) খ্যাতি চায়, আল্লাহ তাকে শুধু খ্যাতিই দেন আর যে লোকদেখানোর জন্য করে, আল্লাহ তাকে লৌকিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।’^{১৪}
- » রিয়ার উপকরণ থেকে দূরে থাকা। যেসমস্ত বিষয়ে অন্তরে আত্মতুষ্টি চলে আসে বা লোকসম্মুখে প্রকাশে অন্তর আনন্দিত হয়, সে কাজগুলো প্রকাশ থেকে বিরত থাকা।
- » নফল আমলগুলোকে যথাসম্ভব গোপন রাখা।
- » খ্যাতি, প্রশংসায় আনন্দিত না হওয়া এবং নির্মোহ থাকার অধ্যবসায় করা।

[১৩] মুসনাদু আহমাদ : ২৩৬৩০

[১৪] সহিহুল বুখারি : ৬৪৯৯

ছোট ছোট বিষয়ের বর্ণনায় কুরআন

বটবৃক্ষ একদিনেই হয়ে যায় না। বীজ থেকে চারা হয়, চারা থেকে গাছ, বয়সে তা বেড়ে হয় বিশাল মহিরুহ। বিরাট বটবৃক্ষ সবার দৃষ্টি কাড়ে। ছোট ছোট গাছগুলো নজর এড়িয়ে যায়, অথচ একদিন সেটাই দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

ঠিক তেমনই দানের অভ্যাস। অন্যদের সহযোগিতার অভ্যাস তৈরি হয় ছোট ছোট জিনিস থেকেই। তখন যাকাত দেওয়া এবং সাদাকা করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়, সাদাকার অংশ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ রববুল আলামিন আমাদের ওপর অনুগ্রহ করে তাই ছোট ছোট বিষয়েরও যত্ন নিতে বলেছেন, বরঞ্চ এ অভ্যাসগুলো না থাকাকে নিন্দা করেছেন। এরই সুন্দর একটা নমুনা আমরা দেখতে পাই সুরা মাউনে। এ সুরার সর্বশেষ আয়াতে নিন্দনীয় স্বভাব হিসেবে আল্লাহ বলেছেন, ‘এবং যারা ছোট ছোট বিষয় (মাউন) দেওয়া থেকে বিরত থাকে।’

মাউন বা ছোট ছোট জিনিস কী?

এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে—

১. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত, যা তিনি ধনীদের ওপর ফরজ করেছেন। যাকাতের সম্পদের পরিমাণ যতই হোক না কেন, তা যেন অতি সামান্যই। কেননা ধনীকে তার সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ বা ২.৫% দান করতে বলা হয়েছে। যে মহান আল্লাহ তাকে এত এত নিয়ামত দিয়েছেন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এতটুকু সম্পদ দান করা কি আসলেই বেশি কিছু! তা যেন অতি ক্ষুদ্র! মাউন!

মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য যেমন তারা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন, তেমনই তারা যাকাতের সামান্য হিসসার ব্যাপারেও অনাস্তরিক। মদিনার মুনাফিকদের অবস্থাও ছিল তাই। তারা যাকাত প্রদানের ব্যাপারে টালবাহনা করত, যেমন করত সালাতের ব্যাপারে।

২. গৃহস্থালির ব্যবহার্য সাধারণ যেকোনো জিনিসপত্রকে বলে ماعون (মাউন)। যেমন : কোদাল, হাঁড়ি-পাতিল, আগুন ইত্যাদি। এগুলো প্রতিবেশীর সাধারণ প্রয়োজনে দেওয়া যেতেই পারে। এতে প্রদানকারীর কোনো ক্ষতি নেই। টিউবওয়েল থেকে পানি নিলে মালিকের কী ক্ষতি! চুলা থেকে আগুন প্রতিবেশীকে দিলে কি নিজেদের

চুলায় আগুন কম পড়বে? স্কু-ড্রাইভার, কোদাল প্রতিবেশী সাময়িক সময়ের জন্য ব্যবহার করতে নিলে কী এমন সমস্যা হয়ে যাবে? সুরা মাউনে উল্লেখিত নিন্দনীয় শ্রেণি এসব অতি সাধারণ ব্যাপারেও কণ্ঠস্বী করে।

৩. কেউ বলেছেন, মাউন হচ্ছে পানি, লবণ ও আগুন—যা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া নিষেধ। একটি হাদিসে আছে, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহর রাসূল! কোন কোন জিনিস দিতে অস্বীকার করা নিষেধ?’ আল্লাহর রাসূল বললেন, ‘পানি, আগুন ও লবণ।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! পানি তো বুঝলাম। কিন্তু আগুন ও লবণের বিষয়টি কী?’ তিনি বললেন, ‘যে আগুন দিল, সে যেন এ আগুনে তৈরি সব খাবার সাদাকা করল; যে লবণ দিল, সে যেন সেই লবণ দিয়ে তৈরি সুস্বাদু সব খাবার সাদাকা করল। পানি পাওয়া যায় এমন জায়গায় যে অন্যকে পানি পান করাবে, সে যেন ৬০টি প্রাণ আযাদ করল; আর যেখানে পানি পাওয়া যায় না, সেখানে যে অন্যকে এক ঢোক পানি পান করাল, সে যেন একটি প্রাণ বাঁচাল। আর যে একটি প্রাণ বাঁচাল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই বাঁচাল!’

সুবহানাল্লাহ! সাধারণ বস্তুর সহায়তায় কত বড় বড় ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম কতই-না চমৎকার ধীন!

আল্লাহর হক এবং বান্দার হক

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর আরোপিত হকগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

১. আল্লাহর হক। যা শুধু আল্লাহ এবং বান্দার মাঝেই সীমাবদ্ধ; তৃতীয় কারও ভূমিকা এখানে নেই। যেমন : সালাত, সিয়াম, পর্দা ইত্যাদি।
২. বান্দার হক। যে হকগুলো আদায় করা আল্লাহর আদেশ, তবে এর সম্পর্ক বান্দার সাথে বান্দার। যেমন : আমানতদারিতা, সহযোগিতা, সম্পদের হক আদায় করা ইত্যাদি।

সুরা মাউনের শুরুর অংশে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের হকের কথা বলেছেন, মানুষের হক অনাদায়কারীকে তিরস্কার করেছেন। পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহর হক আদায়ের কথা বলেছেন, অনাদায়কারীকে তিরস্কার করেছেন।

এ থেকে একটা বিষয় ফুটে ওঠে, মানুষের হকের ব্যাপারে গাফিল থেকে শুধু ইবাদত করে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না। মূলত যে মানুষের হক আদায় করে না, সে আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারেও সচেতন থাকে না।

তেননি আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ থেকে নিছক মানবিক কাজ ও সমাজসেবা করেও সাদ্চা মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত মুমিনই প্রকৃত মানুষ। সে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে যত্নশীল থাকে, মানুষের হক আদায়েও থাকে সচেতন।

কথায় আছে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।’^{১৫}

আল্লামা ইবনু কাসির রাহিমাতুল্লাহ ‘সাধারণ গৃহস্থালি দিতেও অস্বীকার করে’ এ আয়াতের তাফসিরে কত সুন্দরই না বলেছেন, ‘অর্থাৎ, তারা না তাদের রবের ইবাদত সুন্দরভাবে করে আর না রবের সৃষ্টির প্রতি ইহসান করে।’

প্রকৃতপক্ষে হক আদায় করা আত্মিক উৎকর্ষের একটি অঙ্গ। যার নফস অধিক পরিশুদ্ধ, সে সবসময় চায় অন্যের হক আদায় করে দিতে এবং নিজের হক যথাসম্ভব ছাড় দিতে। সে জানে, তাকে কিয়ামাতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে অন্যের হক সম্পর্কে—তা সে দিয়েছে কি না। আর তার অধিকার সম্পর্কে তো জিজ্ঞাসিত হবে ওই ব্যক্তি, যার ওপর তার হকটা ছিল। অথচ অধিকার আদায়ের প্রবণতা আজকাল আমাদের মধ্যে এমনভাবে গেড়ে বসেছে, আমি নিজেই যে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছি, সেদিকে দ্রুক্ষেপই থাকে না! অধিকারের ফিরিস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বড় মাহির, কিন্তু দায়িত্ব আদায়ের বেলায় যেন ভুলোমনা। আল্লাহ আমাদেরকে অধিকার অর্জন ও হক আদায়ের মাঝে ভারসাম্যতা রক্ষার তাওফিক দিন।

আমাদের যত্নহীন সালাত আদায় এবং রবের দয়া

আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুরা মাউনে সালাত-সম্পর্কিত উদাসীনতা বুঝাতে বলেছেন, ‘আন সালাতিহিম সাছন’ অর্থাৎ যারা তাদের সালাতের সম্পর্কে উদাসীন। সালাত সম্পর্কে উদাসীনতা বুঝাতে আরবি ভাষার রীতি অনুসারে ‘আন’ ও ‘ফী’ দুটি শব্দের প্রয়োগের অবকাশ আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এখানে ‘ফী’ শব্দটি

[১৫] সুনানুত তিরমিযি : ১৯৫৫

ব্যবহার করেননি, ‘আন’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শব্দ দুটির প্রায়োগিক অর্থে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান।

আল্লাহ যামাখশারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, এই দুইটার মধ্যে কী পার্থক্য? তাহলে আমি বলব—

‘আন স্বলাতিহিম’-এর মর্মার্থ হলো সালাতের ব্যাপারেই উদাসীন হওয়া এবং তার প্রতি লক্ষ্যেপ কম করা। আর এটা হচ্ছে মুনাফিকদের সিফাত। সে এতটুকু উদাসীন যেন সে সালাত ছেড়ে দিতে চায়।

পক্ষান্তরে এখানে ‘ফী’ শব্দের প্রয়োগ হলে মর্মার্থ দাঁড়াত, তারা সালাতের মধ্যে উদাসীন। অর্থাৎ, সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়, তাদের মাঝে উদাসীনতা ভর করে, শয়তান তাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা প্রক্ষেপণ করে, তারা খুশুখুয়ু পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারে না ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে দুর্বল মুমিনের সালাতের অবস্থাও এমন হতে পারে। ফলে তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন দুনিয়াবি অনেক কথা তাদের মাথায় চলে আসে, সালাতের মধ্যে উদাসীনতা তৈরি হয়, ভুলে যায় কত রাকাত হলো, কয়টি সিজদা হলো।

যদিও এই উদাসীনতাও সুন্দর কিছু নয়, উত্তম কিছু নয়; কিন্তু মানবীয় দুর্বলতা একে সবসময় অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ এমন মুমিনদের হতাশ করেননি, তাদের ব্যাপারে ওয়াইলের ঘোষণা দেননি। যদি তাই হতো, তাঁকে ভয় পেয়ে যারা সালাত করে কিন্তু সব হক মেনে সালাত আদায় করতে পারে না, তারা ভেঙে পড়ত এবং ভাবত, আমার বুঝি ছাড় নেই! আল্লাহ এই শ্রেণির মুমিনের ওপর ইহসান করেছেন। তাদের আশাকে জিইয়ে রেখেছেন, যেন তারা প্রচেষ্টারত থাকে।

এটাই হচ্ছে আন সালাতিহিম ও ফী সালাতিহিমের সূক্ষ্ম পার্থক্য। সুবহানাল্লাহ! এই ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এত সূক্ষ্মতা অবলম্বন করেছেন যাতে মুমিনরা হতাশ হয়ে না যায়।

আপনি কি দেখেননি এবং আপনি কি দেখেছেন

সূরা মাউন শুরু হচ্ছে এভাবে, ‘আপনি কি দেখেছেন?’ এ রকম আরেকটি কথা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা ফিল। সূরা ফিলের শুরুতে আল্লাহ বলেছেন, ‘আপনি কি দেখেননি?’

উভয় স্থানেই দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বিস্ময় বুঝানোর বিষয়টি স্পষ্ট। এরপরও প্রকাশভঙ্গি দুই রকম। কেন?

এর কারণ খুঁজতে আমরা সুরার বিষয়বস্তু দেখতে পারি। সুরা ফিলে আল্লাহ তাআলা অতি বিস্ময়কর ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং তাঁর ক্ষমতার সক্ষমতা বা অলৌকিকতাকে উল্লেখ করেছেন। যখন কোনো আশ্চর্যজনক কিছু ঘটে কিংবা আমরা প্রত্যক্ষ করি, আর তার সাথে সম্পৃক্ততা হয় আনন্দের, তখন আমরা বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ করি—এ কী! তুমি এটা দেখোনি?! না দেখলে দেখে নাও!

আল্লাহ সুরা ফিলে, ‘আপনি কি দেখেননি’ বলে ফিলের ঘটনার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং যেন বলছেন, বিষয়টি জেনে আপনি আনন্দিত হবেন। কারণ, সেটি ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে এক অভয়।

অপরদিকে সুরা মাউনে বিস্ময়ের সাথে নিকৃষ্টতাকে তুলে ধরা উদ্দেশ্য। নিকৃষ্ট কোনো কিছুর সাথে নিজেকে আমরা যুক্ত করতে চাই না। বরং কেউ যদি যুক্ত থাকে, তখন বিস্ময় নিয়ে হ্যাঁসূচক প্রশ্ন ছুড়ে দিই এভাবে—তুমি মুভি দেখো! তুমি গানও শুনো! এই প্রশ্নের ধরনে কেমন যেন তিরস্কার, ভৎসনা, তাচ্ছিল্য লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ততা সুন্দর নয়।

এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন, ‘আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে?’ অর্থাৎ সে তো দেখার মতোই না। কতই-না নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে। যে কিনা পরকালের বিচারকে অস্বীকার করে, তার দ্বারা ইয়াতিমের সাথে দুর্ব্যবহার-সহ নিকৃষ্ট সব কাজই হতে পারে। কাজেই, তাকে দেখার মধ্যেও আনন্দের কিছু নেই, সে তো না দেখারই উপযুক্ত!

দুটো কথা, শুধু প্রকাশভঙ্গিতেই না বলেও কত কথা বলা হয়ে গেল। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার কালামের কোনো তুলনা হয় না!

সুরা কুরাইশের সাথে সুরা মাউনের সামঞ্জস্য

সুরা কুরাইশে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বাইতুল্লাহর রবের ইবাদত করতে বলেছেন। যারা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইবাদত করে না, আল্লাহ এ সুরায় তাদের অবস্থা ও চিত্র তুলে ধরেছেন।

সূরা কুরাইশের শেষ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরাইশদের ওপর তাঁর এক অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলছেন, ‘যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাইয়েছেন।’

আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় রিজিক ভোগ করেও যারা অতি তুচ্ছ ব্যাপারে কার্পণ্য করে, এ সূরায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই সমস্ত লোকদের নিন্দা করেছেন। তাদের প্রতিও যারা অসহায়দের খাবার খাওয়ায় না এবং খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহও দেয় না।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সূরা কুরাইশে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরাইশদের ওপর তাঁর নিয়ামত উল্লেখ করেছেন, যেন তারা সে নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ তাঁর ইবাদতে আকৃষ্ট হয়। আর এ সূরায় আল্লাহ তাঁর ইবাদত থেকে গাফিল থাকার পরিণতি সুস্পষ্ট করেছেন, যেন তারা তাঁর ইবাদত ছাড়ার দুঃসাহস না করে।

কুরাইশরা আল্লাহর নামে কুরবানি-সহ নানা ইবাদত করত ঠিকই, তবে তারা নানাভাবে শিরকও করত এবং তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহ এ সূরায় স্পষ্ট করে দিলেন, আল্লাহর ইবাদতের জন্য পরকালে বিশ্বাসী হওয়া জরুরি। পরকালে বিশ্বাসী না হলে তারা যতই আল্লাহর ইবাদত করুক, সে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে না এবং ইবাদতগুলো আল্লাহর জন্য ইবাদত বলেও পরিগণিত হবে না।

শব্দে শব্দে সূরা মাউন

০১	أَرَأَيْتَ	আপনি কি দেখেছেন	আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে?
	الَّذِي	(তাকে) যে	
	يُكَذِّبُ	মিথ্যা অভিহিত করে	
	بِالدِّينِ	বিচারকে	
০২	فَذَلِكِ	সে তো ওই ব্যক্তি	সে তো ওই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।
	الَّذِي	যে	
	يَدْعُ	ধাক্কা দেয়	
	الْيَتِيمَ	ইয়াতিমকে	

আল-কুরআনের সান্নিধ্যে

০৩	وَلَا يَحْضُ	এবং উৎসাহিত করে না	এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না।
	عَلَى طَعَامٍ	খাবারের ব্যাপারে	
	الْمُسْكِينِ	মিসকিনের	
০৪	فَوَيْلٌ	কাজেই দুর্ভোগ	কাজেই দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের
	لِلْمُصَلِّينَ	(ওইসব) সালাত আদায়কারীদের জন্য	
০৫	الَّذِينَ هُمْ	যারা	যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন
	عَنْ صَلَاتِهِمْ	তাদের সালাত সম্বন্ধে	
	سَاهُونَ	উদাসীন	
০৬	الَّذِينَ هُمْ	যারা	যারা লোকদেখানোর জন্য তা করে
	يُرَاءُونَ	দেখায়	
০৭	وَيَمْنَعُونَ	এবং বিরত থাকে	এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।
	الْمَاعُونَ	সংসারের প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস (দেওয়া হতে)	

